লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আর ভালোবাসা

সুমিতা চক্রবর্তী

"আমিও কি ভালবাসিনি? আমার তো আবার ইচ্ছা হয়—কোম্পানিটা খুলি—লাভ, লাভ অ্যান্ড লাভ।"—'জীবন রহস্য' (১৯৯২, মিত্র ও ঘোষ) নামের যে আত্ম-স্মৃতি-কাহিনি লিখেছেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তার শেষের দিকে আছে এই বাক্যটি। আরো অনেক কথাই আছে ঐ রচনাটিতে। একজন লেখক জীবনকে কিভাবে গ্রহণ করেছেন, গ্রহণ করতে চান, গ্রহণ করে আবার তা পাঠকের জন্য নিজের কল্পনা ও বীক্ষণ মিশিয়ে পুনরায় গড়ে দেন কিভাবে—সে সম্পর্কে বহু বাক্যে গাঁথা এই আত্ম-স্মৃতি-কথা। এটি পড়লে লেখককে কেবল জীবন-দ্রষ্টা ও রূপ-স্রষ্টা নয়—মানে হয় লেখক একজন মগ্ন দার্শনিক। কখনো কখনো কোনো কোনো বাক্যকে ঈষৎ পরস্পর-বিরোধীও মনে হয়েছে। কিন্তু তার জন্য লেখকের ভাবনায় কোনো অসঙ্গতি আছে বলে মনে হয়নি। মনে হয়েছে, জীবন নামক বহু-কোণ, বহু-পরত, বহু-বর্ণ বিষয়টির মুখোমুখি দাঁড়াবার চেষ্টা যদি কেউ করেন তাহলে ঈষৎ পরস্পর-বিরোধিতা কেবল স্বাভাবিকই নয়, তা-ই যথার্থ, তা-ই প্রকৃত দেখা।

লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়-কে তাঁর উপন্যাস পাঠে বিশিষ্ট কোনো দার্শনিকবোধের অধিকারী বলে মনে হয় না আমাদের—যদি না নিবিড় ও সংরক্ত ভালোবাসাকেই এক ধরনের দর্শন বলি। সে-কারণেই ঐ বাক্যটি আমাদের কাছে সর্বাধিক তাৎপর্যময় বলে মনে হয়েছে তাঁর শিল্পী-মানস সম্পর্কে। অত্যন্ত প্রগাঢ় এক ভালোবাসার শক্তির অধিকারী ভাষা-শিল্পী এই লেখক। কাকে ভালোবাসা? এই জীবনকে, এই বেঁচে থাকাকে—প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি প্রাণীর শ্বাসবায়ু টেনে নেওয়ার প্রক্রিয়াটিকে ভালোবাসবার এই প্রায় অলৌকিক ক্ষমতাকেও এক জীবন-দর্শন বলা চলে অতি অবশ্যই। এই প্রেম-ই লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৃষ্টির উৎস-কেন্দ্র বলা যেতে পারে।

এজন্যই তাঁর লেখার অবলম্বন রূপে সাধারণত নির্দিষ্ট কোনো বিষয়কে চিহ্নিত করা যায় না। অথবা তা করা গেলেও সেই নির্দিষ্ট বিষয়টি অচিরেই বিষয়ের বহিরাবরণ বলে প্রতীতি হয়। ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে আসল বিষয়টি—তা হল মানুষ ও তার জীবনযাপন। এবং সেই জীবন-যাপনের প্রতিটি কোষ সিক্ত করে দেওয়া ভালোবাসা। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের তিনটি উপন্যাস আমরা নির্বাচন করেছি তাঁর সৃষ্টির এই কেন্দ্রীয় শক্তির দিকটি তুলে ধরবার জন্য, তাঁর প্রতিভার স্বধর্ম অনুভব করবার জন্য। 'কুবেরের বিষয় আশয়' (১৯৬৭), 'হাওয়াগাড়ি' (প্রথম খণ্ড ১৯৭৯,

দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৮০) এবং 'শাহজাদা দারাশুকো' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৯১)।

এই নির্বাচন কিছুটা বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টি রেখেও করা হল। 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসে চল্লিশ-উত্তীর্ণ কুবের সাধুখাঁ সালকে-র বাসিন্দা। সাধারণ একটি চাকরি পেয়েছে। টানাটানির মধ্যেই কণা কণা সুখ আহরণ করা জীবন তার। কিন্তু বড় কিছু গড়ে তোলার এক নিহিত আকাঙ্ক্ষা তাকে ঠেলে নিয়ে যায় কলকাতার শহরতলিতে। জমি কেনা-বেচা দিয়ে শুরু। টাকা আসতে থাকে। জমির দাম বাড়ছে। কুবের স্বপ্ন দ্যাখে পড়ে থাকা জমিতে গড়ে তুলবে এক বিস্তৃত ভূ-সম্পত্তি। পরিবারের সকলের থাকার মতো বাড়ি; বাগান, পুকুর, গোয়াল; নিজের নামে রাস্তাঘাট, স্টেডিয়াম। সেই স্বপ্ন সত্যি হয়ে ওঠে তার জীবনে। বড় কিছু করবার নেশা তাকে আরো টানে। অনেকখানি নদী পেরিয়ে এক দ্বীপভূমিতে প্রাচীন ভূম্যধিকারীর গড়—বিস্তৃত আবাদি জমি আর বাগান সহ কিনে নেয় কুবের। নিজে হয়ে যেতে থাকে এক জল-জঙ্গলের দেশের মানুষ। বাবা-মা-ভাই, স্ত্রী-সন্তানদের জন্য তার এক-বুক মায়া কিন্তু ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে সে! কিসের যেন অজানা টানে। তার চেহারায় বসে যাচ্ছে জল-মাটির নুনে পোড়া কালো রঙ।

নিজেরই নেশায় নিজেই জড়ায় সে। ভূ-স্বামিত্ব আর নারী যেন একই নাগপাশে বাঁধা। বন্ধন ক্রমে পেষণ হয়ে ওঠে কারণ নারী কেবল অধিকৃত সম্পত্তি হয়েই থাকে না। তার আছে নিজস্ব চাহিদা। গৃহের, সঙ্গের, প্রেমের, শিশুর চাহিদা। পুরুষের মতো গড়ে তোলবার নেশা এবং সেই নেশার নির্মমতা সে বুঝি সম্পূর্ণ বোঝে না। সে বোঝে না পুরুষের সব দর্প আর খামখেয়ালি কর্ম-নেশার গোপনতম কেন্দ্রে কোথায় এক দুর্বোধ্য অসহায়তা রক্তাভ হয়ে আছে। জীবনের কাছ থেকে পাওয়া কোন্ এক অদৃশ্যপ্রায় কিন্তু সুবিপুল মার। সেই আঘাতের যন্ত্রণা ভোলবার জন্যই বুঝি বা তার নিরন্তর ছুটে বেড়ানো বহির্জগতে।

'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসের কুবের সাধুখাঁকে খানিকটা এভাবেই গড়েছেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। ছাত্রজীবনে এক বন্ধুর সঙ্গে সে গিয়েছিল এক দেহজীবিনী মেয়ের ঘরে। তার সাহচর্যে তার শরীরে রোগ ঢুকেছিল কিনা তা উপন্যাসে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়নি। কিন্তু ঢুকেছিল এক পাপবোধ। কুবেরের চরিত্রে ঐ পাপবোধের নিরন্তর কন্টকমুখ-স্পর্শকেই লেখক খানিকটা কুবের চরিত্রের চালক-শক্তির মতো ব্যবহার করেছেন। গৌরবর্ণ কুবেরের হাতের আঙুলে কালো ছোপ দেখা দিতে থাকে যখন, তখন কুবের ভাবে—সেই কিশোরকালের অবৈধ নারীসঙ্গের ফলে অর্জিত রোগেরই চিহ্ন এই দাগ। তার মনের একটি ভিতরের কোণ শূন্য হয়ে যেতে থাকে। সে তার স্ত্রী বুলাকে বারবার বলবার চেষ্টা করে তার

জীবনের সেই অতীত ভুল—'স্যাড এক্সপিরিয়েন্স'-এর কথা। ঠিকমতো বলবার অবকাশ গড়ে ওঠে না। বলাও হয় না তার। নিজের মনের অপরাধী শূন্য-কেন্দ্রটিকে সে বহন করে নিজেই। অভ্যন্তর মনের এক বিন্দু পাপবোধ-ভারাক্রান্ত বিষাদকে ঘিরে গড়ে উঠতে থাকে কর্মবীর কুবের।

সত্যিই কি কোনো রোগ ছিল তার? এ-সত্যটি প্রমাণ-সিদ্ধ নয় উপন্যাসে। কুবের বারবার ডাক্তারের কাছে যাবার কথা ভেবেছে, কিন্তু যায়নি। রোগজনিত কোনো শারীরিক অসুস্থতা বা অক্ষমতা দেখা দেয়নি তার। দুটি সুস্থ ও সুন্দর সন্তানের পিতৃত্বের সুখ সে লাভ করেছে। তার হাতের আঙুল বা কনুইয়ের দাগের দিকে কারোরই লক্ষ পড়েনি। কেবল মাঝে মাঝে কেউ কেউ ভেবেছে—তার গৌরবর্ণ কালো হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। কলকাতায় যখন চাকরি করত কুবের তখন অল্প বেতন সত্ত্বেও ছিল ছিমছাম, চটপটে এক সু-বেশ নাগরিক যুবক। কিন্তু বিষয় আশয় গড়ে তোলার নেশা লাগলে সে কলকাতা ছেড়ে যখন শহরতলিতে বড় মাপের ঘর-গেরস্তি গড়ে তোলে; তারপর আরো দূরে লবণাক্ত জলরাশি সন্নিহিত নির্জন দ্বীপে গিয়ে পত্তন করে সুবিস্তৃত আবাদের—তখন তার চামড়ার বহিরাবরণ থেকে ঝরে পড়ে যায় ঐ চাকচিক্যের পালিশ। জলমাটির নিত্য-সংস্পর্শের কৃষ্ণাভা ছেয়ে ফেলে তার চামড়া; শরীরে জমে মেদ—কিছুটা সম্পদের, কিছুটা হয়তো বা ফসলের রস-স্বাদী আকাঙ্ক্ষার রূপ।

বহু বিচিত্র ধরনের উপন্যাস লিখেছেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। মাটির নিবিড়তায় ফলে ওঠা গাছ-পালা, জলে-জঙ্গলে বিচরণশীল পশু-পাখি নিয়ে লিখেছেন। মানুষের গড়ে তোলা ঘরবাড়ি, বিষয় আশয় নিয়ে; কখনো একান্ত শহরের মানুষের অন্য কোনো ব্যবসায়ের নেশা—কারখানা-কোলিয়ারি; কিংবা অর্থ সঞ্চয় ও লগ্নির বিভিন্ন খুঁটিনাটি ঘেরা জটিল জাল—এসব নিয়েও উপন্যাস লিখেছেন। খেলার জগৎ, গবেষক-পণ্ডিত-অধ্যাপকের জগৎ; মাঝি-জেলে-চাষির জীবন এসেছে তাঁর কোনো-না-কোনো উপন্যাসে। আবার ইতিহাসের বিশাল-জঙ্গম প্রেক্ষাপট, সরাসরি ইতিহাসের বিখ্যাত মানুষ নিয়েও কাজ করেছেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। কখনো মুঘল-ইতিহাসের জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, দারাশুকো; কখনো নেহেরু, জিন্না হয়েছেন তাঁর উপন্যাসের চরিত্র। কিন্তু সর্বত্রই তাঁর কেন্দ্রীয় পুরুষ-চরিত্রগুলির মধ্যে এই সাদৃশ্যটি আছে। তারা কিছু একটা গড়তে চায়, চায় বিস্তৃত হতে। গৃহজীবন তাদের কাছে মূল্যহীন নয়, উপরন্তু পরম আদরের—ভালোবাসার—কিন্তু বৃহতের হাতছানির অপ্রতিরোধ্য টান অস্বীকার করবার মতো ক্ষমতা তাদের নেই। সেই 'বৃহৎ' আবার কেবলই নৈসর্গিক বিশালতা নয়, পাহাড়, সমুদ্র বা অরণ্যের টানের মতো। সেই

'বৃহৎ' কোনো-না-কোনো ভাবে মিশে আছে কিছু-না-কিছু গড়ে তোলবার সঙ্গে। 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসে এই আকর্ষণ ভূ-সম্পত্তি ও আনুষঙ্গিক স্থাবর ও জঙ্গম সমৃদ্ধির উপকরণ আহরণের রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। 'হাওয়া গাড়ি' উপন্যাসের নায়ক দিলীপ বসুর আছে এই নেশার দুটি পর্যায়। প্রথমে কয়লাখনি; পরে মোটর গাড়ি কেনা ও বিক্রি করা। উল্লেখযোগ্য, দিলীপ বসু কিন্তু ঠিক নিজে বড়লোক হবার জন্য এই দুটি কাজের একটিতেও নামেনি। 'কয়লা-খনি'র ব্যবসার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল কয়েকজন বন্ধু মিলে; কাজে নেমেও পড়েছিল কয়েকজন মিলে। কিন্তু দিলীপের কাছেই কাজটি বারবার নেশার রূপ নিয়ে দেখা দেয়। গাড়ির ক্ষেত্রে তার নেশা হল পুরোনো, ফেলে রাখা গাড়ি কিনে নিয়ে সারিয়ে আবার সেই বাতিল গাড়িগুলিকে নিজস্ব মর্যাদায় পথে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। টাকা খুব একটা আসত না এই ব্যবসায়ে। কিন্তু পুরোনো বাতিলকে নতুন করে ব্যবহারযোগ্যতা ও মর্যাদা ফিরিয়ে দেবার মধ্যে যে জীবন গড়ার এক নেশা আছে তারই টানে নিজেকে না বেঁধে থাকতে পারত না দিলীপ বসু।

'শাহজাদা দারাশুকো'—এই বিশাল ক্যানভাস-এর ঐতিহাসিক উপন্যাসটিতেও কিন্তু পুরুষ চরিত্রের ঐ একই আদর্শ রক্ষিত হয়েছে—যদিও তার বাইরের চেহারা বেশ কিছুটা আলাদা। এই উপন্যাস দারাশুকো-র নামে আখ্যায়িত হলেও উপন্যাসে দুই প্রজন্মের দুই পুরুষকেই নায়কের মর্যাদা দেওয়া চলে। প্রথম জন দারা-র পিতা সম্রাট শাহজাহান। জাহাঙ্গীর-এর তৃতীয় পুত্র খুর্রম্-এর শাহজাহান হয়ে ওঠার যুদ্ধ-সঙ্কুল ও সংরক্ত নিষ্ঠুর পথ সবিস্তার বর্ণনা করেছেন লেখক। তারপর শাহজাহান-পুত্রদের মধ্যে দারাশুকো হয়ে উঠেছেন নায়ক। এই নায়কত্বের মহিমা দাঁড়িয়ে আছে উভয়েরই এক সুবিপুল সৃষ্টির স্বপ্নের উপর। দু'জনেই গড়তে চেয়েছিলেন দেশ। সুবে হিন্দুস্তান-কে সংহত দেখতে চেয়েছিলেন শাহজাহান। তাঁর বন্ধন-রশি ছিল শক্তি। তাগদ। শাহী তাগদ তাই বাদশাহ হবার জন্য পিতার প্রতি বিদ্রোহ, বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের প্রতি নিষ্ঠুরতম আচরণ তো তুচ্ছ কথা—আত্মজ সন্তানদেরও কঠিন শাস্তি দিতে বাধেনি তাঁর। যতদিন এই শাহী শক্তি তাঁর কব্জায়, ততদিন এই সুবিশাল সাম্রাজ্য তাঁর হাতের মুঠোয়। তাই হারালে চলবে না এই সিংহাসন।

আরো একটি গড়ে তোলা ছিল সম্রাট শাহজাহান-এর। যে-নারীকে ভালোবাসতেন সেই অর্জুমন্দ বানু, বেগম হবার পরে যাঁর নাম হয়েছিল মমতাজ মহল—তাঁর মৃত্যুর পর শাহজাহান-এর কল্পনায় ভেসে উঠেছিল এক অপরূপ মঞ্জিল। জীবনের দ্বিতীয় পর্বে, সব কিছু ঢেলে দিয়ে সেই 'তাজমহল' গড়বার নেশায় নিজের সাম্রাজ্যও যেন হারাচ্ছিলেন বাদশাহ শাহজাহান।

দারাশুকো-র চোখে ছিল এক ভিন্ন হিন্দুস্থানের স্বপ্ন। শাহী তাগদ-এর সেই যুগে তাঁর মতো স্বপ্ন অন্য কারো কল্পনাতেও আসেনি। তিনি চেয়েছিলেন সর্ব ধর্ম সমন্বয়ী এক উদারতার বন্ধনে বাঁধা হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান-পার্সি-র সম্মিলিত হিন্দুস্তান। এক প্রেমের ভারতবর্ষ। ধর্ম নয়, তিনি স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন ধর্মের নিহিত সত্যের বাণী। যা, তাঁর কাছে সর্ব ধর্মের অন্তরেই একতম আর অভিন্ন বলে প্রতিভাত হয়েছিল। এই স্বপ্ন বুঝি কোনো যুগে কোনো দেশেই সম্পূর্ণ সফল হবার নয়—তাই দারাশুকো-র স্বপ্নও ব্যর্থ হল। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এই উপন্যাসের মুখবন্ধে লিখেছেন—

'শাহজাদা দারাশুকো হিন্দুস্থানে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মচিন্তার মিলনবিন্দুটি খুঁজতে গিয়ে সময়ের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে যান। তাই তিনি হিন্দুস্থানের ইতিহাসে একটি কালো গোলাপ। ব্যথা, সৌন্দর্য, কালের ইতিহাসের সঙ্গে এই গোলাপ জড়িয়ে গেছে।...

হিন্দুস্থানের ভাবী বাদশা শাহজাদা মহম্মদ দারাশুকো খাঁটি মুসলমান হিসেবে ইসলামে বিশ্বাসী হয়েও বারবার বলেছেন, সত্য কোনও ধর্মের একচেটিয়া নয়। ঈশ্বরে যাওয়ার রাস্তাও অনেক।"

এই ধর্ম-রাজ্যপাশেই হিন্দু-মুসলমানের ভারতকে—শাসিত ও শাসকের ভারতকে বাঁধতে চেয়েছিলেন দারাশুকো। এটাই ছিল তাঁর গড়বার স্বপ্ন। পারেননি। সফল হননি কিন্তু তাঁর ব্যর্থতা সত্ত্বে তিনিই নায়ক। কারণ তাঁর মতো সত্যকে গড়ে তোলার অপরূপ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সিংহাসনে কেউ বসে না। দারাশুকো সিংহাসন রক্ষা করতে পারেননি কারণ সিংহাসনের অধিকার বজায় রাখার পক্ষে তাঁর স্বপ্নটি যথাযোগ্য ছিল না।

উপন্যাসের নায়ক-পুরুষদের চরিত্রে এই যে নেশার উত্তাপ ও প্রবাহ সঞ্চারিত করেছেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তার মূলে আছে প্রগাঢ় জীবন-প্রেম। পৃথিবীকে নিবিড় করে পাওয়ার ইচ্ছায়, স্পর্শযোগ্য সাবয়বতায়। রক্তে-মাংসে-মজ্জায়। আবার কল্পনায়-স্বপ্নে-চৈতন্যে। একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়-ঘনত্বে আর অতীন্দ্রিয় অ-লৌকিকত্বে। এই কারণে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে নানাবিধ ভালোবাসার কামনা নানারকম প্যাটার্ন তৈরি করে। ত্যাগের মধ্যে দিয়েও ভালোবাসা ব্যক্ত হতে পারে—এই তত্ত্ব বোধহয় তেমন বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের। তাঁর কাছে ভালোবাসার একটি স্বাভাবিক লক্ষণ হল অর্জন করবার, আয়ত্ত করবার আকুলতা।

এই অর্জন আর আয়ত্তীকরণের লক্ষ্য রূপে সর্বাগ্রে তিনি স্থান দিয়েছেন স্থিতিবোধকে। মানুষ পৃথিবীতে আসে—আসার অল্পদিনের মধ্যেই বুঝতে শেখে যে, সে মৃত্যুর দিকে মুখ করে হাঁটছে। মৃত্যুর দিকে অনন্ত প্রবহমানতার পথে তার চিত্তে স্থিত থাকবার যে ব্যাকুলতা জন্মায়, প্রিয়জনকে সুস্থিত শান্তি দেবার যে অভিলাষ—তারই চালনায় মানুষ মৃত্তিকার উপর নিজের অ-সংশয় অধিকার চিহ্নিত

করতে চায়।

এই স্থিতি-প্রার্থনার সবচেয়ে বড় উপকরণ মৃত্তিকা। যে-মাটিতে ধান হয়, যে-মাটিতে বাড়ি ওঠে। কুবের চেয়েছিল ঘরবাড়ি আর অনেক আবাদের এক চর, দিলীপের ফ্ল্যাট কেনার চেষ্টা এই চাওয়ারই আর একটি দিক। শাহজাহান আর দারাশুকো চেয়েছিলেন সমগ্র হিন্দুস্তান—নিজের নিজের মতো করে।

মাটির সঙ্গে একান্ত লগ্ন হয়ে আছে মানুষের আদিমতম দুটি জৈবনিক প্রার্থনা—ঘর আর ফসল—বাসভূমি আর খাদ্য। নিজের লেখা সম্পর্কে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নিজের কথা আমরা পেয়েছিলাম একদা 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা (১৩৮৩)-র পৃষ্ঠায়। সেখান থেকে তুলে আনি লেখকের নিজের উপলব্ধির ভাষা।—

"জমি। এর সঙ্গে জড়িত—দখল। এর সঙ্গে জড়িত—আশ্রয়। এর সঙ্গে জড়িত—অঙ্কুর। কিংবা নবজন্ম। আর জড়িত—লোভ।

*　　*　　*　　*

আকাশের নিচে নির্জনে কত মাঠ পড়ে থাকে। তাদের ওপর দিয়ে হাঁটবার সময় অদ্ভুত লাগে। প্রান্তরের সাতটা তালগাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। এরাই সেই প্রান্তরের রক্ষক। ধানক্ষেত খুঁজে লোকে কচ্ছপ বের করছে। পুকুর কাটতে গিয়ে বারো হাত নিচে নৌকোর গলুই পাওয়া গেল। একদা তাহলে এখানে নদী ছিল। জমির অনন্ত রহস্য। তার সঙ্গে কোর্ট কাছারি। দলিল দস্তাবেজ। উকিল মুহুরি। লোভ। শরিকানি। অন্তহীন।

জমির সঙ্গে সঙ্গে আমার অজান্তেই আমি ফসলে চলে গিয়েছিলাম। একটি ধানচারা। তাকে বড় করে তার থেকে ধান তোলা। তার স্বভাব। সেই ধানের সঙ্গে আমাদের দেশের মানুষের কোন অতীত থেকে নাড়ির যোগ—সবই আমাকে ভাবাতে লাগল।"

'কুবেরের বিষয় আশয়' পড়লে বোঝা যায় এই জমি, ফসল, ধান এবং অধিকার বোধের কি আশ্চর্য রহস্যময় ও রূপময় চিত্র এঁকে দিয়েছেন লেখক তাঁর উপন্যাসে।—

"কুবেরের চোখের সামনে যতদূর দেখা যায়—বোরো ধানের সবুজ গোছ মাথা ঠেলে উঠেছে। ক'দিনের মধ্যে সারাটা তল্লাট আরো সবুজ হয়ে কালো মেঘ হয়ে উঠবে। তাদের গায়ে গায়ে বোশেখ মাসে আকাশ চলকে এসে পড়বে। এখনই কিছু কিছু বিয়েনকাটি বেরিয়ে পড়েছে। দু'একটা গোল হতে শুরু করেছে।"

"ভদ্রেশ্বর জানে ধানের নেশা বড় নেশা। এই পৃথিবীতে নেশার বস্তু যে কত—তার ঠিক ঠিকানা নেই। লোকে গাছপালা লতাপাতা বসায়—ফলটা পাকুড়টা ঘরে বসে পাবে বলে! নদীর জলে মাছের ডিম কোটি কোটি ভেসে বেড়ায়। ভেড়ি বাঁধ দিয়ে সেই জল কোটালে টেনে নিয়ে ডাঙায় ধরে রাখতে পারলে দেদার মাছ! ধান ছড়ালে দেদার ধান। মাটিই সব দেয়—জলই সব দেয়।"

"লণ্ডভণ্ড মাঠ দেখে বোঝাই যায়, চাষ আবাদে আগাগোড়াই কুবেরের ভরাডুবি। তবু ধানকাটা, আছড়ানো অব্দি পরপর সব করে যেতে হবে। পুরোটা গচ্চা জেনেও থামা যাবে না। এর নাম ধান। নেশায় নেশায় জড়ানো। যদি শেষ দিকে বাকি শিষের সবটুকু দুধে ভরে যায় তাহলে তো বাজিমাৎ।"

'হাওয়া গাড়ি' উপন্যাসটি শহুরে জীবনযাপনের পটভূমিতে লেখা। সেখানে কয়লাখনির বর্ণনসূত্রে মৃত্তিকা-গর্ভের সম্পদ-নেশার কথা এসেছে। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন সেই লোভের তথা অর্জন-বাসনার স্বরূপ। ন্যাশনালাইজড্ কোল-কোম্পানির মাঝারি চাকুরে দিলীপ বসু জড়িয়ে গেছে এই নেশায়। তার মনের তলা ছেঁচে লেখক তুলে এনেছেন ভাবনা—

"দিলীপ নিজের কথাও অনেকটা এভাবে সাজাতে পারে। খাদান করতে নামালি—অথচ খাদান এক্সপ্যান্ড করতে দিবি না কেন? এক্সপ্যানসন ছাড়া—গ্রোথ ছাড়া—কোন গ্রোইং জিনিস বেঁচে থাকে? ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপ্রেশনের পথই তো বন্ধ হয়ে যায়।"

এ-ই হল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নায়কের কথা। বৃদ্ধি—এক্সপ্যানসন ছাড়া ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের পথ থাকে রুদ্ধ। এর একটা চেহারা নিশ্চয়ই ধনতন্ত্রবাদ—পুঁজিবাদ। কিন্তু কেবল তাই বললেই শেষ হয়ে যায় না এর তাৎপর্য। সমবায়িক বা যৌথ অস্তিত্বের উৎপাদনের ক্ষেত্রেও যদি 'এক্সপ্যানসন' এবং 'গ্রোথ' (দুটি ঠিক একই অর্থ বোঝায় না) বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সত্যিই একটা সময়ে মানুষ নিজেকে পরিপূর্ণভাবে অভিব্যক্ত করবার পথ পাবে না। এর অন্তহীন লোভের নেশায় প্রবল বিপদের সম্ভাবনাও আছে—ব্যক্তির এবং সমাজের। এক্সপ্যানসন মানেই যে গ্রোথ নয়—তা ভুলে যাওয়া সমাজের পক্ষে ভয়ঙ্কর হতে পারে। দিলীপ বসু খানিকটা এই বিপজ্জনক পথে পা রেখেছিল।—

'এই পৃথিবী এখন দিলীপের অন্তহীন লাগে। বিশেষ করে ডালহৌসি। এইটুকু জায়গা। অথচ এর এক ফুট অন্তর শেয়ার, লগ্নী, কমিশন। আমি এত বছর তাহলে কি করেছি? শুধু চেয়ারে বসে অন্যের বোঝা বয়েছি—আর মাস মাইনে পেয়ে খুশি থেকেছি। এখন আমার সামনে সারা ডালহৌসি। তার ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেই হয়। পুরো ডালহৌসিকে বোঝাতে যদি পারি—যদি কনভিন্স করা যায়—তাহলে তো অঢেল ক্যাপিটাল। সেই ক্যাপিটালের কার্পেটের ওপর দিয়ে আমি এখন হেঁটে যাবো।"

একথা ভাবলে ভুল হবে যে লেখক, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এই পরিপূর্ণ ধনতন্ত্রবাদের জয়গান গেয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। যদিও তেমন অভিযোগ ওঠবার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না কারণ সেই এক্সপ্যান্ডেড হয়ে চলার নেশায় বিভোর নায়ককে বড় মমতায় রূপাবয়ব দিয়েছেন তিনি। তাই বলে জীবনের কাছে তাদের জয়ী হয়ে দেননি। অর্জন আর বিস্তারের নেশায়, নিজের নামে অঢেল সম্পদ গড়ে তোলবার নেশায় কুবের সাধুখাঁ হারিয়েছে তার স্ত্রীর একান্ত প্রেম। পুরুষের মনোযোগ-বিহীন নারী। নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে করতে খানিকটা অমোঘ নিয়মের মতোই এক মনোযোগী পুরুষকে শরীর আর মনের একাংশ খানিকটা না দিয়ে ফেলে সে পারেনি। শরীরে কালো ছোপ ছড়িয়ে গেছে কুবেরের। সে ভেবেছে—এ তার কৈশোরের গোপন নিষিদ্ধ নারী-গমনের পাপের ছাপ। হয়তো এ তার মনের

ঐ অশান্ত, আগ্রাসী অধিকারবোধেরই প্রতীকী ছায়া। পৃথিবীকে অধিকার করে নেবার এই উন্মত্ত নেশার বিরুদ্ধে লেখকের নিষেধ সংকেত। শেষ পর্যন্ত মাটিতে বুক পেতে চলা সাপ দংশন করেছে কুবেরকে। বিষে জমে গেছে তার শরীর। এক্সপ্যানসন-এর নেশায় আচ্ছন্ন কুবের চাঁদের গায়ে মই লাগিয়ে তার জ্যোৎস্নার নীল মাখন আঙুলে তুলে নিতে চেয়েছিল। মই টলে গিয়ে ভূ-পাতিত হয়েছে সে। এমনি করেই মাটি একদিন নিয়েছে প্রতিশোধ।

'হাওয়াগাড়ি'-র দিলীপ বসুর একমাত্র পুত্র রবি নক্‌শালবাড়ি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছে। ধনতন্ত্রের মূর্ত প্রতিবাদ। সে-ও হারিয়েছে তার পত্নী রানী-কে। একা থাকতে থাকতে প্রাক্-বিবাহ প্রণয়ী প্রবোধের আহ্বানে আবার ধরা দিয়েছে রানী। এমন কি ধারণ করেছে প্রবোধের সন্তান।

শাহজাদা দারাশুকো অবশ্য পূর্বোক্ত দুই নায়কের মতো দখল-বাদী ছিল না কোনোদিন। কিন্তু তাকে শোধ করতে হয়েছে পূর্বপুরুষের দখলদারি-র ধন। অসহায়ভাবে এক চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় যুদ্ধের দায়ভাগ গ্রহণ করে দাঁড়াতে হয়েছে তাকে।

তবু, মনে হয় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই জীবন-বীক্ষণে কোনো ভুল নেই যে, মানুষের রক্তধারায় এই দখলদারি আর এক্সপ্যানসনের নেশা লোহিত ও শ্বেত কণিকার মতোই সত্য। এই নেশার সঙ্গে কখনো লড়াই কখনো আপোস করেই পার্থিব সভ্যতা চলে; বাড়ে কমে; জন্মায় আর অবস্রিত হয়। এর কোনো বিকল্প পথ নেই।

মানব-সভ্যতায় অধিকারবোধের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন। মানুষ অর্জন, সঞ্চয়, ভোগ—সবই নিজের জন্যই করে সত্য—কিন্তু তার গড়ে তোলা সম্পদ তার উত্তরপুরুষ ভোগ করবে—এই স্বপ্ন তাকে চালিত করে। সর্বদাই সে উত্তরপুরুষ নিজেরই সন্তান না-ও হতে পারে। বরং অনেক সময়ে নিজের সন্তানের প্রতি দায়িত্বভার থাকায় তা পুরুষের নিজের কর্মজগতের বাড়বার নেশার ব্যাঘাতও সৃষ্টি করতে পারে। তবু মানুষ যে পূর্বপুরুষের অর্জন ও জীবনযাপনের দায়ভার নিয়েই পৃথিবীতে এসেছে—তা সে ভোলে না কখনও। উত্তরাধিকারবোধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ। তাই কুবের সাধুখাঁর মা 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসটিতে এতখানি গুরুত্ব পেয়েছেন—

"বাবু হরিরাম সাধুখাঁ কুবেরের পাঁচ পুরুষ আগে বংশের সবচেয়ে কৃতী মানুষ। তিনি ঠগী দমনের সময় কোত্থেকে যেন বহু কাঁচা পয়সা পান। সেই সুবাদে গঙ্গার ঘাটে লবণের গোলার অংশ কিনে ব্যবসা শুরু করেন। দুই বিয়ের দরুন বিপুল সংসার হয় তাঁর। অনেক বাড়িও বানাতে হয়েছিল ফলে। দোল দুর্গোৎসব ছাড়াও দিয়তাং ভুজ্যতাং তাঁর রক্তে ছিল।

কুবেরের বাবার আমলে এসে ভাগের ভাগ তস্য ভাগ হয়ে তাদের পড়েছিল আড়াই খানা ঘর আর তিন দেওয়াল ভর্তি অয়েলপেন্টিং, তার বাবাই প্রথম চাকুরে।...

কুবের জানে উনিশ শো উনচল্লিশ পর্যন্ত দীর্ঘ একশো দেড়শো বছর চাকুরেদের সোনার সময় গেছে। ...সেই সোনার যুগে কুবেরের মা বউ হয়ে আসেন। তিনি ফেলে ছড়িয়ে সংসার করেছেন। সাধুখাঁ পরিবারের পুরনো কালের রবরবা দিদি-শাশুড়ির মুখে শুনতে শুনতে তিনি অন্য জায়গায় চলে যেতেন। ... কুবেরের মা পরের বাড়ির মেয়ে হয়েও এই বাড়ির ঐতিহাসিক গৌরব তিনি নিজের পাওনা বলে আঁকড়ে ধরেছেন। তাই জীবনে কোথাও তিনি অর্ডিনারি হতে রাজি নন।"

এই উত্তরাধিকার চেতনার এক তির্যক প্রকাশে এই উপন্যাসে চালচুলোহীন মিথ্যাভাষী চতুরতা দিয়ে জীবনে টিকে থাকতে সচেষ্ট ব্রজ দত্ত তার পিতা রজনী দত্তের আত্মজীবনী লেখে। 'হাওয়াগাড়ি' উপন্যাসে উত্তরাধিকার ব্যাপারটা অদ্ভুত রহস্যময় হয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে। কয়লা-খনির শিল্প ও ব্যবসার জাতীয়করণ হবার আগে একাধিক শিল্পপতি এই পথটিকে এক্সপ্যানসনের উপায় বসে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের সার্থকতাও কম ছিল না। মাঝারি চাকুরে দিলীপ বসু হঠাৎ যেন নিজের রক্তে সেই সামূহিক উত্তরাধিকারের তেজ ও নেশা অনুভব করেছে। কিন্তু জাতীয়করণ-অধীন কোম্পানি ব্যক্তির সেই আত্মবিকাশের পথ রুদ্ধ করে দিতে কৃতসংকল্প। দিলীপ সফল হতে পারেনি।

পুরনো গাড়ি কেনবার সময়েও সে যেন এক উত্তরাধিকারের স্বাদ পায়। আগের আগের মালিকদের যুগ ও জীবন থেকে আধুনিক যুগে চলে আসা একটি গাড়ি যেন বিচিত্র উত্তরাধিকার-সূত্রেরই এক জঙ্গমতা। তার সর্বশেষ কেনা অস্টিন ট্যুরার গাড়িটিকে সে উত্তরাধিকার-চ্যুত করতে পারেনি। কলকাতার নামকরা ধনী ও অভিজাত বাঙালি কালু ঘোষ আততায়ীর রিভলভারের গুলিতে মারা গিয়েও থেকে গেল সেই গাড়িতেই। যখন খাদান-এক্সপ্যানসনের কাজ থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হয়েছে দিলীপকে, অফিসে পুরোনো সহকর্মীদের কাছে সে তীব্রভাবে অপমানিত; অবশেষে মিথ্যা এক খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত—তখন এই কালু ঘোষের অ-লৌকিক সত্তা তার বন্ধু হয়েছে, তাকে দিয়েছে ভরসা আর মনের আশ্রয়, এভাবেই প্রয়াত পুরুষের কাছে জীবন-যাপনের শক্তির উত্তরাধিকার লাভ করেছে দিলীপ বসু।

'শাহজাদা দারাশুকো' উপন্যাসের সমস্তটা জুড়েই মুঘলশাহীর উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্বের বিবরণ। তখ্‌ৎ আর তাগদ-এর এই সংঘাতে দারাশুকো কিছুটা ধারা-বিচ্ছিন্ন এক রাজপুত্র। তবু উত্তরাধিকারের ভালো-মন্দ যথেষ্টই বর্তেছে তার চরিত্রে।

উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি ভাবিত করে বলেই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের নারী বা পুরুষ কেউই নিঃসন্তান থাকতে চায় না। প্রায় প্রত্যেকেরই আছে পুত্র সন্তান। সমাজ-সম্মত বা সমাজ-অসমর্থিত—যে-কোনো উপায়ে নারী গর্ভ ধারণ করে। সমাজের ভয়ে বা শারীরিক বিপদের সম্ভাবনাতেও গর্ভপাত করতে কিছুতেই রাজি হয় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে জলে ডুবে মরতে হয় তাদের,

যেমন হয়েছে 'কুবেরের বিষয় আশয়'-এর আভার—কুবেরের সন্তান ধারণের পর। যেমন হয়েছে রানীর—প্রবোধের সন্তান ধারণের পর। সন্তান ধারণে মৃত্যু সম্ভাবনা জেনেও শাহজাহানের সন্তান ধারণ করেছেন মমতাজ মহল।

আমরা প্রবন্ধটি শুরু করেছিলাম জীবনের প্রতি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভালোবাসার টানের কথা দিয়ে। জীবন ও মানুষ এই টান-ভালোবাসায় জড়িয়ে আছে—-নানাভাবেই একথাটি প্রতিষ্ঠা করেছেন লেখক তাঁর উপন্যাসগুলিতে। তার একটিকে আমরা বলতে পারি রূপদৃষ্টি, আর একটিকে প্রেমদৃষ্টি। এই জীবনকে সুন্দর দ্যাখে মানুষ। সকলের দৃষ্টির স্বরূপ সমান নয় কিন্তু রূপের টান সকলেরই উপর সমভাবে মায়া ঝরিয়ে দেয়। সেই রূপমুগ্ধতার হাজারো উপাদান, হাজারো অভিনবত্ব। কয়েকটি উদহরণ পেশ করছি—

প্রকৃতি : "সামনেই তালগাছের সারির মাঝখানে চাঁদ কালকের চেয়েও আরও নীচে নেমে এসেছে। ...দু'চোখে যতদূর দেখা যায়—তার সবটা জুড়ে শুধু চাঁদ। অথচ কোনো জ্বালা নেই সে-আলোয়। নীল। নরম।...

মাথার ওপরে হাওয়ায় ঝুপসি তালপাতাসুদ্ধ কাঁটাতোলা ডালগুলো নড়ছে। নীচে তাকালেই মাঠ ভর্তি ধান, আধখানা দিঘি জুড়ে জ্যোৎস্নায় পদ্ম ফুটে আছে—সার দিয়ে দাঁড়ানো পরীদের যে কেউ এক্ষুনি উড়ে যেতে পারে।" (কুবেরের বিষয় আশয়)

" ...হরিণটা সেই একই ভঙ্গিতে অস্টিন ট্যুরার, তার পাইলট, পাইলটের বন্ধুকে খুব মন দিয়ে দেখছে। মাথাটা একদিকে হেলানো। এক দিকের কান খাড়া, অন্যটা ন্যাতানো। আর সেই হরিণের পেছনে হরিণের পর হরিণ। সারা চিড়িয়াখানার হরিণ। একের পর এক। ছুঁচলো মুখ। কাজলটানা আচ্ছন্ন চোখ। মুখ ওপরে তোলা সারি সারি গলা। মাথায় সিং। নয়তো সিংয়ের আভাস। সব চোখ দিলীপদের দিকে। দেখলেই মনে হবে পার্কিং সেটে দাঁড় করানো একপাল হরিণ।" (হাওয়াগাড়ি, প্রথম খণ্ড)

"দুর্গের অনেক আলো নিভে গেছে। অনেক তারা তখনো আকাশে মহতব বাগের গায়েই বিরাট তেঁতুল গাছের শেকড় ছুঁয়ে যমুনার জল পাক খাচ্ছে। ...জ্যোৎস্নায় আশমান এখন হলুদ কাচ হয়ে আছে। আশমান জুড়ে আমারই জন্যে তারার প্রদীপ। যমুনার জল ভাঙার আওয়াজ জুড়ে জুড়ে ঠিক কোন রাগিনী হয়ে উঠলো।" (শাহজাদা দারাশুকো, প্রথম খণ্ড)

স্থাপত্য : "হঠাৎ এমন নদীনালার মাঝখানে গম্ভীরভাবে পুরনো দিনের একটা বিশাল স্ট্রাকচার দাঁড়ানো। আগেকার খিলেন গাঁথুনি। ...কুবেরের পেছনে কত বছরের পুরনো, একটা দুর্গের কঙ্কাল হাড়গোড় বের করে কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁদিকে মেদনমল্লর দিঘি। ...সামনেই সমুদ্র। কোণে দিঘির মাঝখানে বাঁধানো জলটুঙ্গি কালের ভারে ধসে পড়েছে। ... এখনকার তুলনায় একেবারে পকেট সাইজের ইটের গাঁথুনি। তবে খুব চওড়া। দু দু'টো লোক দৌড়ে যেতে পারে তার ওপর দিয়ে। ...কুবের একচোট হেসে উঠল। সারাটা দুর্গ কাঁপিয়ে সেই হাসির আওয়াজ দিঘির চত্বরে গিয়ে আছড়ে পড়তেই পুরনো দামের ওপরের পাখির ঝাঁক একেবারে ছররা খেয়ে আচমকা দিগ্বিদিক হারিয়ে সাঁই সাঁই করে উড়তে লাগল। কাদার গাঁথুনির পরিগুলো দিঘির দুধারে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সে সব ঢাকা পড়ে গেল।" (কুবেরের বিষয় আশয়)

"সেলিম জাহাঙ্গীর মারা যাবার পর রাজধানী আগ্রা নয়া বাদশা শাহজাহানের খাতিরে নতুন করে সেজেছে। দুপুরে জহুরের নামাজের পর আগ্রা দুর্গে দেওয়ানি আমের দরবারি চত্বর খুলে দেওয়া হয়েছে।...

আগ্রা দুর্গে কোন সিঁড়ি নেই। সিঁড়ি থাকলে হাতি ওপরে উঠতে পারে না। সবই ঢাল। ঢাল বেয়ে হাতি ওঠে। ইনসান ওঠে। ঘোড়া ওঠে। নামে। সিঁড়ি শুধু মাচান বুরুজে ওঠার জন্য। সেই সব সিঁড়ি খুব ঘোরানো। যা বেয়ে বেয়ে পাহারার বন্দুকচীরা চৌকিতে উঠে গিয়ে ওপরে দাঁড়ায়।"

(শাহজাদা দারাশুকো, প্রথম খণ্ড)

নর-নারী-রূপ : "আভা পেছন ফিরে একমনে চুল বাঁধছে---দাঁতে ফিতে কামড়ানো—শরীরেরই কোন ঢিলে টুকরোর কায়দায় ডুমো ডুমো কালো পাথরের মালাটা গলায় একদিকে ঝুলে পড়েছে। ... গালের পাশে খানিক অন্ধকার—না ছায়া, চিবুকে চাপা পড়ে আলো অমন কালচে হয়ে যায়। সিঁথি ঘেঁষে ঘন কালো চুল খুব নিয়ম মেনে গেছে দুধারে।"

(কুবেরের বিষয় আশয়)

'খোদ বাদশার হুকুমে শাহজাদা শারিয়ার আজ নওরোজের পয়লা দিনে শানদার সাজে সেজেছেন। গায়ে চীনা সার্টিনের কাম্বাদার। নিচে ফ্রানসিসির বনাতের সুলতানি কুর্তা। কোমরের ডানদিকে কওতল তলোয়ার। যে ঘোড়াটিতে বসে তিনি এখন আগ্রা দুর্গের আকবরি দরওয়াজা থেকে মোরি দরওয়াজার দিকে চলেছেন—তার গায়ে রঙিন আলপোষ, কাজাই; লাগাম। শাহজাদার মাথায় উষ্ণীষের সরবন্ধে বসানো ময়ুরের পালকটিও দুপুরের রোদে চকমক করে উঠলো।"

(শাহজাদা দারাশুকো, প্রথম খণ্ড)

"মেয়েটি সদ্য কিশোরী। কাজে আসার আগে হায়াতবাগের কেওয়াড়ি থেকে মেয়েটি একটি লাল বুনো ফুল তুলে নিয়ে দুহাত পেছনে পাঠিয়ে নিজের বেণীর শুরুতে বসিয়ে নিচ্ছে। মুখের এক দিক দেখা যাচ্ছে ওপর থেকে। সেদিকটায় এইমাত্র ভোরের প্রথম রোদ এসে পড়লো। দীঘল লকলকে ভঙ্গি। চোখও টানা। নাকটি বাঁশি। বেশ সুন্দরী।" (শাহজাদা দারাশুকো, প্রথম খণ্ড)

লক্ষ করা যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌন্দর্য বর্ণনার ধরন ঠিক ফটোগ্রাফিক নয়। বরং তা যেন কিছুটা নির্বাচনী লক্ষণাক্রান্ত। একটি ফ্রেমের মধ্যে তাঁর ভালো লাগার অংশটুকুকে তুলে ধরেন; অথবা দেখান কেবল সেইটুকু যেটুকুতে আছে বিশেষ কোনো পরিচয়। যেমন আগ্রা দুর্গের বর্ণনায় সিঁড়ি না থাকা, আর কেবলই ঢাল থাকার দিকে আঙুল তুলে বুঝিয়ে দিলেন দুর্গের চরিত্র। প্রকৃতি বা মানুষের সৌন্দর্য বর্ণনায় যে দেখছে তার চোখ, যে পরিবেশের মধ্যে দেখা হচ্ছে সেই পরিবেশের আদলটি এনে শব্দে আঁকা ছবিটাকে দেওয়া হচ্ছে এক ভাবগত সমগ্রতা। সৌন্দর্য দর্শনধারীর চোখেই। তার ভালোবাসা অথবা অ-প্রীতির আলাদা আলাদা রঙ আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে রঙ ভালোবাসার। তাঁর গল্পে-উপন্যাসে মানুষ সব হারাতে হারাতেও, মরতে মরতেও সৌন্দর্যের আর প্রেমের আহ্বানে সাড়া দেয়।

জীবনের প্রতি দুর্মর ও রহস্যময় ভালোবাসাকেই যখন আমরা বলেছি শ্যামল

গঙ্গোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের নিহিত উপলব্ধির সারৎসার তখন সেই ভালোবাসার স্বরূপ কিভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁর লেখায় তা-ও আমাদের একটু বুঝে নিতে হবে।

মানুষ ভালোবাসে তার পারিপার্শ্বিক সব কিছুকেই। তার সাজানো ঘর আর ভাঙা ঘর; ফুল-পাখি-আকাশ-মাঠ-নদী-চাঁদ। এসবের অজস্র উদাহরণ তাঁর লেখায়। মানুষ ভালোবাসে আকাশ, পত্র-পল্লব, পাখিকে; পোষা কুকুর, গরু, মোষ-কে; ভালোবাসে হরিণ। 'হাওয়াগাড়ি' উপন্যাসে একটি হরিণ ভালোবাসার প্রতীক হয়ে যেন বারবার ফিরে এসেছে। চিড়িয়াখানার হরিণ—দীর্ঘ মায়াবি চোখ, সোনা-বাদামি রং। দিলীপকে দেখে পালায় না। বন্ধুর মতো চেয়ে থাকে। মনে মনে দিলীপ যখন নিরাশ্রয় তখন সে ঐ হরিণটিকে শেষরাত্রে চিড়িয়াখানার দেয়াল টপকে গিয়ে তুলে আনে। এনে রাখে নিজের ফ্ল্যাটের গ্যারাজ-স্পেস-এ। জীবনের প্রতি দিলীপের অমলিন ভালোবাসার মূর্ততা যেন সেই হরিণে।

হরিণটিকে মেরে খাবে বলে চুরি করে নিয়ে যায় তিন যুবক। তখন দিলীপের কেনা সেই অস্টিন ট্যুরার-এর আগের মালিক কালু ঘোষ—যার বিদেহ আত্মা ঐ গাড়ির সঙ্গেই থেকে গেছে—সে নিজের স্বরূপে ফুটে উঠে হরিণটিকে সরিয়ে আনে। তাকে আবার ফিরিয়ে দিয়ে আসে চিড়িয়াখানায়। শরীরবিহীন আত্মা কালু ঘোষ। শরীরী অবয়বে ফুটে উঠতে খুবই কষ্ট হয় তার। তবু হরিণটিকে বাঁচাবার দায়ে সে কাজ করতেই হয় তাঁকে। এমনি করে বাঁচিয়ে রাখা ভালোবাসাকে। উপন্যাসের শেষে সর্বস্ব হারানো দিলীপ যখন তার শিশু পৌত্র খোকনকে নিয়ে এসে 'হরিণ' বলে ডাকে—তখন ভালোবাসার নিবিড়তা আর অনিঃশেষতা আবার অনুভব করি আমরা।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রায় সব লেখাতেই সেজন্য শিশুরা আসে। শিশুদের অমল সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়। জীবনের সঙ্গে মানুষের ভালোবাসার স্নিগ্ধতম বন্ধন শিশুদের অসহায়তার ছবিও আঁকেন তিনি। জীবনের প্রতি তাঁর মনোভাবের নরম জায়গাটাকে আমরা ছুঁতে পারি।

মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালোবাসার টান উপেক্ষা করা যায় না কিছুতেই। জীবনের প্রতি প্রেমের স্পষ্টতম বিকাশ এই আকর্ষণের ছবিতে। কিন্তু এই সম্পর্কটাই সবচেয়ে জটিল। নর-নারী সম্পর্কের প্রেম আর অ-প্রেম—সরল নয় কোনোটিই। 'কুবেরের বিষয় আশয়' আর 'হাওয়াগাড়ি'—দুটি উপন্যাসেই জটিল মানব-সম্পর্কের উন্মোচন ঘটেছে। পুরুষ সেখানে তার নিজস্ব নারীকে ভালোবেসেও তাকে ছেড়ে যায়। সময় বিশেষে অন্য নারীকে মনে স্থান দেয়, শরীরে গ্রহণ করে। কিন্তু তার

প্রথম নারীকেও মন থেকে সরাতে পারে না। মানব-সম্পর্ক যদি প্রকৃতই একনিষ্ঠ হত তাহলে পৃথিবীতে বহু সমস্যাই থাকত না। কিন্তু মানব-স্বভাব, মানব-প্রেম স্বভাবতই বহুনিষ্ঠ, কেবল সমাজের সুবিধার্থেই তাকে 'এক'-এ বেঁধে রাখা, দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রেম-সম্পর্ককে গোপন রাখা—এই সমস্যার স্বরূপ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে গাঢ়ভাবে ফুটে ওঠে। 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসে কুবের-বুলু, কুবের-আভা, আভা-ব্রজ দত্ত, আভা-সাহেব, সাহেব-বুলু—প্রতিটি সম্পর্ককেই তাদের জটিলতাসহ সরলভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। আমাদের মন প্রশ্ন তোলে না—মেনে নেয়। মানব-জীবনে বস্তুত বহু প্রশ্ন তুলেও স্বভাবের আর অস্তিত্বের অমোঘ টানগুলিকে শেষ পর্যন্ত মেনেই নিতে হয়।

'হাওয়া গাড়ি' উপন্যাসে রানী আর প্রবোধের সম্পর্ক কিছু কুৎসিত রূপ পায় তা প্রেমের বিকৃতির জন্য নয়, প্রবোধের অর্থলোভের ও স্বার্থপরতার কারণে। তবু সেখানেও পাঠক অনুভব করেন যে রানীর কারণেই প্রবোধের এইভাবে এক ভাঙা মানুষে পরিণত হওয়া।

'হাওয়াগাড়ি' উপন্যাসে শিশু সন্তানকে ছেড়ে গেছে তার মা কারণ সে বাংলার প্রথম সারির অ্যাথলিট; দিলীপের পুত্র রবি বেছে নিয়েছে হত্যার রাজনীতি। যদিও তার দিকও দেখবার চেষ্টা করেছেন ঔপন্যাসিক। তবু মনে হয়, হত্যার রাজনীতিতে তাঁর সমর্থন নেই।

আলোচিত তিনটি উপন্যাস এবং শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের অন্যান্য নিদর্শন থেকে মনে হয় মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালোবাসার সম্পর্ককে নানা দিক থেকে আলো ফেলে দেখালেও আসলে তিনি জীবনের প্রতি ভালোবাসাকে মানব সম্পর্ক ছাড়িয়ে এক বৃহত্তর সৃষ্টিশীলতার প্রেক্ষাপটে দাঁড় করাতে চান। এই প্রসঙ্গটি নিয়েই আমরা শুরু করেছিলাম এই আলোচনা। কুবের সাধুখাঁর কাছে সঞ্চয় আর ফলনের নেশায় ফিকে হয়ে গেছে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষা। পরে আভার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেও আভাও তার নিজের কাজের চেয়ে বড় হয়ে ওঠেনি। আভাকেও যেতে হয়েছে আত্মহত্যার পথে। 'হাওয়াগাড়ি' উপন্যাসে দিলীপ বসু তার সাজানো ফ্ল্যাট আর ঘন সংসারটিকে ছেড়ে জীবনের নানান হাতছানিতে বারবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পরিণামে সে হারিয়েছে তার সবকিছু। 'শাহজাদা দারাশুকো' উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসের সত্যকাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেখানে শাহী তখ্‌ৎ আর শক্তির মদমত্ততায় বারবার ছিন্ন হয়ে গেছে স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, ভাই আর বোনের স্নেহবন্ধন। কিন্তু এই উপন্যাসে ক্ষমতার সঙ্গে মানুষের প্রেমের বন্ধন; সত্য ধর্মের সঙ্গে মানুষের প্রাণের বন্ধন হয়েছে উপস্থাপিত।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে আরও দুটি প্রসঙ্গ তুলতে হয়। প্রথম প্রশ্নটি এই—নারী ও পুরুষের চরিত্রের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট একটি পার্থক্য কিন্তু তিনি করেছেন। তাঁর উপন্যাসের রসে এবং রূপে খানিকটা সামন্ত্রতান্ত্রিকতার রেশ অনুভূত হয়। পুরুষ সেখানে কর্তা। পুরুষ সেখানে নিজের সৃষ্ট আত্মমুগ্ধ এক বলয়ের কেন্দ্রে নিজেকে স্থাপন করে। নারীকে সে নিজের ভোগের ও ভালোবাসার বস্তু বলে মনে করে। হিন্দুস্তান-এর বাদশা আর সর্বস্বহীন গানের মাস্টার প্রবোধের মধ্যে এদিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু নারীকে ততটা কর্মদীপ্ত নিজস্ব বলয়ে স্থাপিত করেননি লেখক। অবশ্য 'হাওয়াগাড়ি' উপন্যাসের মালবিকা এক ব্যতিক্রম। সে তার অ্যাথলেটিক্স-এর জগতে নিজের এগিয়ে যাবার নেশাটিকে সন্তান পালনের চেয়ে বড় বলে মনে করেছে। কিন্তু এই তিনটি উপন্যাসের আর যে ক'জন রমণীকে আমরা পাই—বুলু, আভা, রানী, স্বাতী, কুটু, অর্জুমন্দ বানু, জাহানারা, নাদিরা, রানাদিল এবং মীনাক্ষী—সকলেই ভালোবাসার কোনো একজন মানুষকে জড়িয়ে পুরুষ-সাপেক্ষ জীবন যাপনকেই স্বাভাবিক মনে করে। তার বাইরে নিজেদের অস্তিত্ব নিজেদের কাছে হয়ে পড়ে নিরর্থক।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি এই—শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের যে-কোনো লেখায় তাঁর অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি আর পূর্ণতা আমাদের অতীব আশ্চর্য করে দেয়। তাঁর নিজের কথা থেকে জানতে পারি—ইস্পাত কারখানায় কাজ করেছিলেন তিনি। জমি-জায়গা সংক্রান্ত কেনা-বেচা, বাড়ি করা, ফলন—ইত্যাকার বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন একটা পর্বে। চিত্র পরিচালনার বিষয়টিকে দেখেছেন জীবনের অল্প একটু সময়ে। কিন্তু শিল্পীর অভিজ্ঞতা আহৃত হতে পারে বহু সূত্রে। সাধারণ মানুষ কোনও একটি ঘটনা বা কর্মকাণ্ডের কাছাকাছি থেকেও তার অলিগলি সব সময়ে বুঝে নিতে পারেন না। শিল্পীকে পারতে হয়। তাঁর এই তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম চোখ আছে বলেই তিনি লেখক হয়ে ওঠেন। সঙ্গীত আর খেলাধুলো, সঞ্চয়-সংস্থা আর মোটর গাড়ি ব্যবসা, মাছ ধরা, সেমিনার আর পশুপালন—প্রতিটি বিষয়ে যে অনুপুঙ্খ চিত্রণ তিনি অবলীলায় তাঁর লেখায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন তা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য পাঠের এক বাড়তি আকর্ষণ। জীবনের বিভিন্ন দিকের এই ছবিকে উপন্যাসে ধরে রাখার ব্যাপারটিকে একালের অনেক লেখক ও পাঠক মনে করেন মূল্যহীন। এক উপন্যাস-লেখককে বলতে শুনেছি—ধান চাষের বিষয় জানতে গেলে উপন্যাস পড়ব কেন? ধান-চাষ বিষয়ে বই পড়ব। এমত উক্তির প্রতিবাদও নিষ্প্রয়োজন। ধান-চাষ বিষয়ক বইতে সেই জীবন-সত্যটি উদ্ভাসিত হবে না যা ধান-ফলানোর নেশায় আচ্ছন্ন একজন মানুষ জীবন নামক রহস্যময় বস্তুটির সঙ্গে

প্রাত্যহিক সংঘাতের মধ্যে দিয়ে বুকের মধ্যে এক ভালোবাসার সোনালি ছাপ তুলে নিচ্ছে। সেই জ্বলুনি-পিটুনির মধ্যে দিয়ে পাওয়া মানুষটিকেই উপন্যাসে পাই। তার সঙ্গে ইস্পাত-কর্মী একজন মানুষ বা সাংবাদিক একজন মানুষের গড়নের কিছু পার্থক্য আছেই। ভিন্ন ভিন্ন জগতের মানুষের মুখ কেবল নয়, তার হাত-পা-এর নখ-এর গড়নেও জীবনের লক্ষ রূপের প্রতিবিম্ব ঝলকায়।

সরাসরি যে অভিজ্ঞতার মধ্যে যাওয়া লেখকের পক্ষে সম্ভব হয়নি তার জন্য তিনি গ্রন্থ-জগতের সাহায্য নিয়েছেন—কি বিপুল শ্রমের মধ্যে দিয়ে, তা অনুভব করতে গেলে 'শাহজাদা দারাশুকো' উপন্যাসের দুই তিন পৃষ্ঠা পড়ে নেওয়াই যথেষ্ট। ইতিহাস থেকে সবই পাই কিন্তু মানুষের জীবন্ত হৃদয়কে দেখতে পেলে তবেই তা হবে ঐতিহাসিক উপন্যাস। মুঘল রাজবংশের বেশ কয়েকজন বাদশা-শাহজাদা আর শাহজাদিকে কয়েক শতাব্দী পরে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন লেখক এই উপন্যাসে। সঙ্গে সাধারণ মানুষ তো আছেই। সাধারণ মানুষকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কল্পনা করে নেওয়ার কাজটি ঐতিহাসিক উপন্যাসে সহজেই করা যায়। প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিকেরা তেমনই করেছেন বহুলাংশে। কিন্তু সরাসরি জাহাঙ্গীর, নূরজাহান, শাহজাহান, দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব, জাহানারা-র মতো এতগুলি চরিত্রকে নিয়ে, ইতিহাস সম্পূর্ণ অবিকৃত রেখে এক মানব-আখ্যানকে সত্য করে তোলা—কি সুকঠিন কাজ তা যিনি কখনো লেখার একটুও চেষ্টা করেছেন তিনিই অনুভব করতে পারবেন। এই লেখার অন্তরালে লেখকের নিজেকে গড়ে নেওয়া কতখানি তা আমরা কেবল অনুমানই করতে পারি।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসের মনোরঞ্জক ধারাটিকে পুষ্ট করবার জন্য লেখেন না। তাঁর লেখা একেবারে সাধারণ গল্পপ্রিয় পাঠকের কাছে ততটা জনপ্রিয় নয়ও। কিন্তু যে-পাঠকেরা প্রকৃত সাহিত্যমনস্ক—তাঁদের কাছে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবশ্য-পাঠ্যের তালিকাতেই পড়ে। যে-লেখক পাঠকের মুখ চেয়ে লেখেন না তিনিই প্রকৃত লেখক।

লেখার জন্য এই বিপুল শ্রমের মধ্যে তলিয়ে যাওয়া, আর জীবনের প্রতিটি পরত ও বিন্দু থেকে বহু-বর্ণ আলোর খেলা দেখে নিতে পারা তাঁর পক্ষেই সম্ভব—জীবনকে যিনি আ-হৃদয় ভালোবাসেন। যিনি 'লাভ, লাভ অ্যান্ড লাভ' কোম্পানি খোলবার অভিলাষী।

বানান অপরিবর্তিত।

এবং মুশায়েরা, ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৯৬ প্রকাশিত।